সমকাল

তারিখ ... 08 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

# সাক্ষরতা আন্দোলনে বাংলাদেশ

সাক্ষরতা দিবস | ড. মজিবুর রহমান

শিক্ষা গবেষক; সদস্য, বাংলা একাডেমি এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

'শিক্ষায় বিনিয়োগ, সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ'– জ্ঞানী-গুণী থেকে শুরু করে আমজনতা সবাই এ বিষয়টিকে একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। আজকের দিনে উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নআয়ের মানুষ, সবাই সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহ দেখান। এ রকমটি কয়েক বছর আগেও দেখা যেত না। আমরা সাধারণ মানুষ শিক্ষার গুরুত্ব দেরিতে বুঝলেও আমাদের সংবিধান প্রণেতারা কিন্তু বিষয়টি আগেই অনুধাবন করেছিলেন। তাই বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময়েই সর্বজনীন শিক্ষার বিষয়টি তারা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৭২ সালে প্রণীত আমাদের মূল সংবিধানে বলা হয়– 'রাষ্ট্র ক. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; খ. সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন' (অনুচ্ছেদ-১৭, দ্বিতীয় ভাগ)। দেশের সব মানুষকে শিক্ষার আওতায় এনে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার একটি তীব্র আকুতি প্রকাশিত হয়েছিল এ অনুচ্ছেদে।

আমাদের রাষ্ট্রনায়করা শুরু থেকেই এর বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হয় ১৯৭৩ সালে। বঙ্গবন্ধুর সরকার এ বছর দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে (৩৬,৬১৫টি) সরকারিকরণ করে। সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রাষ্ট্রীয় বেতনভুক্ত করা হয়। এতে করে প্রাথমিক শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এর সুফল অল্পদিনের মধ্যে সবার দৃষ্টিগোচর হয়। ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার হার বাড়তে থাকে। তবে বিভিন্ন কারণে পরবর্তী সময়ে এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। একই সময়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঘটে যায় নানাবিধ ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় শিক্ষার গুরুত্ব তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ১৯৬১ সালে জাতিসংঘে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৬৫ সালে তেহরানে ১২ দিনব্যাপী বিশ্ব সাক্ষরতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী একই বছরের নভেম্বর মাসে ইউনেস্কো কর্তৃক ৮ সেপ্টেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ শুরু থেকেই এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে এবং ২০০০ সালে সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' সম্মেলনের ঘোষণায় সরকার সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

সাংবিধানিক অবস্থান, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এবং বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন (কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন) শুরু করে শিক্ষানীতি ২০১০ পর্যন্ত সব শিক্ষানীতিতে বিষয়টি প্রাধান্য দেওয়া হয়। সব সরকারের আমলেই এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান সরকার বিগত মেয়াদে ক্ষমতায় আসার আগে ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার: ২০০৮-এর 'মানব উন্নয়ন' শিরোনামে ১০.১ দফায় এবং ভিশন ২০২১-এর ৮ দফায় সবার জন্য শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, বিশ্বসভায় প্রদত্ত অঙ্গীকার এবং Millennium Development Goals বাস্তবায়নে সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়। প্রাথমিক শিক্ষায় উপবৃত্তি চালু করা, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণ, বেসরকারি-রেজিস্টার্ড-এনজিও স্কুলগুলোকে ২০১৩ সালে জাতীয়করণ (২৬,২৪৩টি), লক্ষাধিক শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ, প্রাইমারি স্কুলে টিফিন কর্মসূচি চালু, ১৫০০ নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, বিনামূল্যে বই বিতরণসহ নানাবিধ প্রকল্প-প্রোগ্রাম গ্রহণের ফলে ২০১১ সালের মধ্যেই শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়। অন্যদিকে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনসহ সব সরকারের আমলেই নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-সংগঠনগুলো এ ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে দেশের সাক্ষরতার হার ২০১১ সালে ৫৯.৮২ শতাংশে উন্নীত হয় (BBS Bangladesh Literacy Survey 2010, Published in June 2011)। বর্তমানে এই হার মন্ত্রীর তথ্য মতে ৬১ শতাংশ। এত কিছুর পরও দেশের সব মানুষকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা এখনও আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দেশের সব মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছাতে না পারলে আর যাই হোক, সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ফলে দেশের সব নাগরিককে শিক্ষার আলোতে নিয়ে আসা আমাদের জন্য আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনিতর অবস্থায় দেশের সব মানুষকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার জন্য গতানুগতিক পদ্ধতি ও কৌশলের পাশাপাশি নতুন নতুন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। গণশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন কৌশল বাদ দিয়ে কার্যক্রমভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা, সাক্ষরতা কর্মসূচিকে Public-Private Partnership-PPP-র আওতায় নিয়ে আসা, নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে করপোরেট জগৎকে সম্পৃক্ত করা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা এবং বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য 'প্রতিজনে একজন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা' কর্মসূচি বাধ্যতামূলক করা এবং সাক্ষরতা কর্মসূচিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর দক্ষতা ও জনবল বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, অত্যাধিক জনসংখ্যার এ দেশে বর্ধিত জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে হলে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। এ ক্ষেত্রে কালক্ষেপণের কোনো সুযোগ নেই। সরকারের পাশাপাশি দেশের প্রতিটি নাগরিককে স্বউদ্যোগে এই মহাযজ্ঞ সম্পাদনে এগিয়ে আসতে হবে।

majib_74@yahoo.com